অদ্বিতীয়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডুর চিঠি 2
০২. শান্তা উরফে তপন সেন উরফে প্রমীলা 20

০১. শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডুর চিঠি

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে ব্যোমকেশের সহিত যখন সত্যবতীর দাম্পত্য কলহ বাধিয়া যাইত, তখন আমি নিরপেক্ষভাবে বসিয়া তাহা উপভোগ করিতাম। কিন্তু দাম্পত্য কলহে যখন স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির আপেক্ষিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত তখন বাধ্য হইয়া আমাকে ব্যোমকেশের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইত। তবু দুই বন্ধু একজোট হইয়াও সব সময় সত্যবতীর সহিত আটিয়া উঠিতাম না। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে পুরুষজাতির দুস্কৃতির নজির এত অপব্যাপ্ত লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে, তাহা খণ্ডন করা এক প্রকার অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত আমাদের রণে ভঙ্গ দিতে হইত।

কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একদিন শীতের সকালবেলা সংবাদপত্র সহযোগে চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ ও আমি তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। যে ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রক্রিয়া মোটামুটি এইরূপ : কখনও একটি, কখনও বা একাধিক ভদ্রশ্রেণীর যুবতী তাক বুঝিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে। বাড়ির গৃহিণী যদি সতর্ক হন, তিনি দ্বার না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে? একটি যুবতী বাহির হইতে বলে, ‘চিকনের কাজ করা ভাল সায়া-ব্লাউজ এনেছি, দাম খুব সস্তা-কিিনবেন? গৃহিণী ভবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।

এই ধরনের ঘটনা পূর্বে কয়েকবার ঘটিয়া গিয়াছে, আসামীরা ধরা পড়ে নাই। সেদিন কাগজ খুলিয়া দেখি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে আগের দিন দুপুরবেলা কাশীপুরের একটি গৃহস্থের বাড়িতে। ব্যোমকেশকে খবরটি পড়িয়া শুনাইলাম। সে একটু বঙ্কিম হাসিয়া বলিল, 'এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! মেয়েরা তো দুপুরে ডাকাতি করেই থাকে।'

এই সময় সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের পানে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'আহা! মেয়েরা দুপুরে ডাকাতি করে, আর তোমরা সব সাধুপুরুষ।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীকে শুনাইবার জন্য কথাটা বলে নাই; কিন্তু সত্যবতী যখন শুনিয়া ফেলিয়াছে এবং জবাব দিয়াছে তখন আর পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা সবাই সাধুপুরুষ এমন কথা বলিনি। কিন্তু তোমরাও কম যাও না।'

সুতরাং তর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। সত্যবতী তক্তপোশের কিনারায় বসিল, বলিল, 'মেয়েদের নিন্দে করা তোমাদের স্বভাব। মেয়েরা কী করেছে শুনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি কিছু নয়, দুপুরে ডাকাতি।'

আমি খবরের কাগজ হইতে দুপুরে ডাকাতির অংশটা পড়িয়া শুনাইলাম। সত্যবতী বলিল, বেশ, মেনে নিলাম, ওরা দোষ করেছে, পেটের দায়ে অন্যায় করেছে। কিন্তু তোমরা যে

খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয়? তোমাদের তুলনায় মেয়েরা কটা খুন করেছে!'

বেগতিক দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি; এখন স্বাধীনতা পেয়ে তোমাদের বিক্রম বেড়েছে, ক্রমে আরো বাড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরানীর কথা লিখে গেছেন। দেবী চৌধুরানী সেকেলে মেয়ে ছিল, তাতেই এই। যদি একালের মেয়ে হত তাহলে কী কাণ্ডটা হত ভেবে দেখ অজিত!'

সত্যবতী হাত নাড়িয়া বলিল, 'ওসব বাজে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। সত্যিকার কটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারো যেখানে মেয়েমানুষ খুন করেছে?

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিকারের দৃষ্টান্ত চাও! আরে এই তো সেদিন-বড়জোর মাস দুই হবে-জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

সত্যবতী হাসিয়া উঠিল, 'দু'মাস আগে একটা মেয়ে একটা খুন করেছিল। এই দু' মাসের মধ্যে তোমরা কাটা খুন করেছ তার হিসেব দাও দেখি।'

আজকার কাগজেও একটা পুরুষ-কৃত খুনের খবর ছিল কিন্তু আমি তাহা চাপিয়া গেলাম : তৎপরিবর্তে বলিলাম, 'আজকের কাগজে স্ত্রীজাতির নৃশংতার একটা গুরুতর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটা ধোপা এক মহিলার দামী সিল্কের শাড়িতে খোঁচ লাগিয়েছিল, মহিলাটি

বঁটি দিয়ে তার নাক কেটে নিয়েছেন। ধোপার অবস্থা শোচনীয়, হাসপাতালে আছে, বাঁচবে। কিনা সন্দেহ।'

সত্যবতী নির্দয় হাসিয়া বলিল, মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী চোর ডাকাত খুনী–'

আমাদের তর্ক কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বহির্দ্বারের কড়া খটখট শব্দে নড়িয়া উঠিল। সত্যবতী বিজয়িনীর ন্যায় উন্নত মস্তকে ভিতরে চলিয়া গেল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন; একটা পুরুষ্টুগোছের লম্বা খাম দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশের নামে খাম, প্রেরকের উল্লেখ নাই। তাহাকে খাম আনিয়া দিলে সে শঙ্কিতভাবে উহা টিপিয়া-টুপিয়া বলিল, নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। প্রভাতের কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমরা পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায় শরিক হইয়া পড়িবার পর হইতে উৎসাহশীল নবীন লেখকেরা প্রায়ই আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি পঠাইয়া থাকেন, তাই ব্যোমকেশ মোটা খামের চিঠি দেখিলেই তটস্থ হইয়া ওঠে।

বলিলাম, 'পাণ্ডুলিপি নাও হতে পারে। খুলেই দেখ না।'

সে বলিল, 'তুমি খুলে দেখ।'

খাম খুলিলাম। পাণ্ডুলিপি নয় বটে, কিন্তু ব্যোমকেশকে কেহ লম্বা চিঠি লিখিয়াছে; প্রায় একটা ছোটগল্পের শামিল। ব্যোমকেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া তক্তপোশের উপর লম্বা হইল, বলিল, 'প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। সুতরাং তুমি পড়, আমি শুনি।'

তক্তপোশের পাশে চেয়ার টানিয়া আমি চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। হাতের লেখা খুব স্পষ্ট নয়, একটু কষ্ট করিয়া পড়িতে হয়; কিন্তু ভাষা বেশ ঝরঝরে–

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী মহাশয় সমীপে
সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আমার নাম শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু। পুলিস আমাকে খুনের মামলায় জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই নিরুপায় হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। শক্তি থাকিলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতাম, আমার বক্তব্য মুখে বলিলে আরও পরিষ্কার হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আমি পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু হইয়াছি, আমার বাম অঙ্গ অচল হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের মধ্যে অল্প চলাফেরা করিতে পারি মাত্র। তাই বাধ্য হইয়া পত্র লিখিতেছি।

যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের পরিচয় কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার বয়স এখন সাতান্ন বৎসর; স্ত্রী-পুত্র নাই, কেবল তিনটি বাড়ি আছে। বাড়িগুলি ভাড়া দিয়াছি, তন্মধ্যে একটি বাড়ির দ্বিতলে দুইটি ঘর লইয়া আমি থাকি। ভৃত্য রামাধীন আমার পরিচর্যা করে।

শিরোনামায় ঠিকানা দেখিয়া বুঝিবেন আমি কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। রাস্তাটি বেশ চওড়া; যে-বাড়িতে আমি থাকি সেটি রাস্তার এক দিকে, আমার অন্য বাড়ি দু'টি প্রায় তাহার সামনাসামনি, রাস্তার অপর দিকে। এই বাড়ি দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একতলা; ইহাদের যমজ বাড়ি বলিতে পারেন। দু'টি বাড়ির মাঝখান দিয়া খিড়কির দিকে যাইবার সরু গলি আছে।

আমি রোগে পঙ্গু, দু'টি ঘরের মধ্যেই আমার জীবন। পক্ষাঘাত হওয়ার আগে আমি দালালি করিতাম, অনেক ছুটাছুটি করিয়াছি; ছুটাছুটি করিতেই আমি অভ্যস্ত। তাই এখন সারা বেলা জানালার সামনে বসিয়া থাকি, রাস্তার লোক চলাচল দেখি। একটি বাইনোকুলার কিনিয়াছি, তাহাই চোখে দিয়া দূরের দৃশ্য দেখি। বাইনোকুলার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরের দৃশ্যও দেখা যায়; আমার যমজ বাড়ির ভাড়াটেদের উপর নজর রাখিতে পারি। যাহাদের ক্ষমতা আছে। তাহারা সিনেমা থিয়েটার দেখে; আমি জানালায় বসিয়া সাদা চোখে প্রবহমান জীবনস্রোত দেখি এবং চোখে দূরবীন লোগাইয়া নেপথ্যদৃশ্য দেখি। কত বিচিত্র দৃশ্য যে দেখিয়াছি শুনিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু সে-কথা যাক।

মাস দেড়েক আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। বেঁটে-খাটো চেহারা, ঘাড়ে-ছোটা তামাটে রঙের চুল, তারতরে মুখ, নাকের নীচে ছোট্ট একটি প্রজাপতি-গোঁফ আছে। পরিধানে দামী বিলাতি পোশাক, তাহার উপর ক্যামেলাহেয়ার কাপড়ের ওভারকেট। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সসম্রামে বলিল, 'আমার নাম তপন সেন। আসতে পারি?'

আমি তখন জানালার কাছে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, মুখ তুলিয়া বলিলাম, 'আসুন।'

তপন সেন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার সম্মুখে বসিল। আমি বলিলাম, কি দরকার বলুন তো?'

সে জানালার বাহিরে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'আপনার জোড়া-বাড়ির একটা বাড়ি খালি হয়েছে। তাই এলাম, যদি আমাকে ভাড়া দেন।'

বাড়িটা কিছুদিন হইতে খালি পড়িয়া ছিল। আগের ভাড়াটে বাড়ি তছনছ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহা মেরামত ও চুনকাম করাইয়া রাখিয়াছিলাম; ঠিক করিয়াছিলাম ভাল ভাড়াটে না পাইলে ভাড়া দিব না। ছোকরাকে দেখিয়া শুনিয়া ভালই মনে হইল, সাজপোশাক হইতে অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কি করা হয়?'

সে ওভারকেটের পকেট হইতে সিগারেটের কোটা বাহির করিয়া আবার রাখিয়া দিল; বোধ হয়। আমার ন্যায় বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমবশতাই সিগারেট ধরাইল না। বলিল, 'খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি। নাইট এডিটার। সারা রাত কাজ করি আর সারা দিন ঘুমোই।' বলিয়া একটু হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, 'সংসারে কে কে আছে? সে স্মিতমুখে বলিল, 'সবেমাত্র সংসার আরম্ভ করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।'

মনে মনে খুশি হইলাম। ছেলেপিলে থাকিলে বাড়ি নষ্ট করে, দেয়ালে কালি দিয়া ছবি আঁকে। বলিলাম, 'বেশ, আপনাকে ভাড়া দেব। দেড় শো টাকা ভাড়া।'

সে ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে যায়–'

বলিলাম, সাজানো বাড়ি। খাট-বিছানা টেবিল-চেয়ার কাবার্ড সব পাবেন।'

'আচ্ছা, তাহলে রাজী। বাড়িটা একবার দেখতে পারি কি?'

চাবি দিলাম, তপন সেন গিয়া বাড়ি দেখিয়া আসিল। তারপর দেড় শো টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন। এক মাসের ভাড়া।'

আমি টাকার রসিদ লিখিয়া দিয়া বলিলাম, কবে থেকে বাড়িতে আসবেন?

সে বলিল, 'কাল ইংরেজি মাসের পয়লা। বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে, যদি অনুমতি দেন আজই কোনো সময় আসতে পারি।'

বলিলাম, 'বেশ, যখন ইচ্ছে আসবেন।'

তপন সেন চাবি লইয়া চলিয়া গেল। ভাল ভাড়াটে পাইয়াছি ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইলাম।

সেদিন সারা বিকালবেলা জানালায় বসিয়া বাড়ির দিকে তাকাইয়া রহিলাম, কিন্তু তপন তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিল না।

সকালবেলা জানোলা খুলিয়া দেখি উহারা আসিয়াছে। সদর দরজা খোলা। নিশ্চয় রাত্রে কোনো সময় মালপত্র লইয়া আসিয়াছে।

আমার কৌতূহলী চক্ষু ওই দিকেই যাতায়াত করিতে লাগিল। বেলা সাড়ে ন'টার সময় একটি যুবতী আসিয়া ভিতর দিক হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর কয়েক মিনিট গত হইলে খিড়কি দরজার গলি দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। লম্বা ছিমছাম চেহারা, মাথায় একমাথা চুল এলো খোঁপার আকারে ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত, হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি-কেস। ভাবিলাম, সারা রাত কাজ করিয়া তখন ঘুমাইতেছে, তাই তার বউ বাজার করিতে চলিয়াছে।

কিন্তু দুপুর কাটিয়া গেল সে ফিরিয়া আসিল না। একেবারে ফিরিল অপরাহ্নে আন্দাজ চারটার সময়। সদর দরজার কড়া নাড়িল না, গলি দিয়া খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয়। স্বামী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে আমি রামাধীনকে পাঠাইলাম। নূতন ভাড়াটে, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ-খবর লওয়া দরকার। জানালায় বসিয়া দেখিলাম রামাধীন গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িল। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। রামান্ধীনের সহিত কথা বলিয়া মেয়েটি একবার চোখ তুলিয়া আমার জানালার পানে চাহিল, তারপর রামান্ধীনের সঙ্গে দ্বিতলে আমার কাছে উঠিয়া আসিল।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন কাছে হইতে দেখিলাম। ভারী সুশ্রী চেহারা, লম্বা একহারা, মেদ-গ্রিন্থির বাহুল্য নাই; বাঁ। গালের উপর মসুরের মত একটি লাল তিল, তাহাতে মুখের লালিত্য আরও বাড়িয়াছে। একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম, স্বামী-স্ত্রীর বয়স প্রায় একই রকম-তেইশ-চব্বিশ। হয়তো প্রেমে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছে। আজকাল তো কতাই এমন দেখা যায়।

ছোট্ট নমস্কার করিয়া বলিল, ‘আমার নাম শাস্তা। আমাদের কোনো অসুবিধে নেই; খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি।’ তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী যেমন মিষ্ট, গলার স্বরও তেমনি নরম।

বলিলাম, ‘বসুন। আপনি-ই সে মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘আমাকে ‘আপনি বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী।’

বলিলাম, ‘তা-আচ্ছা। তোমাদের বি-চাকর যদি দরকার থাকে, নতুন পাড়ায় এসেছ-’

সে বলিল, 'ঝি-চাকরের দরকার নেই। দু'জনের সংসার, আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।'

বলিলাম, 'বেশ বেশ। তা-আজ তুমি সকালবেলা বেরিয়েছিলে, এখন ফিরলে। সারা দিন কোথায় ছিলে?'

সে বলিল, 'আমি স্কুলে পড়াই। চেতলার দিকে একটা ছোট মেয়েদের স্কুল আছে, সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করি।–আচ্ছা, আজ যাই, ওর খাবার তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যার পর ও কাজে বেরুবে।' শান্তা একটু হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া চলিয়া গেল।

ইহাদের দু'জনকেই আমার ভাল লাগিয়াছে। বর্তমানে ভাড়াটেদের লইয়াই আমার জীবন। তাহারা আমার বাড়িতে বাস করে, ভাড়া দেয়, নিজের ধান্দায় থাকে; মেলামেশা নাই। জোড়া-বাড়ির অন্য অংশে একটি মাদ্রাজী পরিবার থাকে; তাহারা আমার ভাষা বোঝে না, কেবল মাসান্তে ভাড়া দিয়া রসিদ লইয়া যায়। ইহাদের সহিত আমার হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। কিন্তু এই নবীন বাঙালী দম্পতি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

জানালায় বসিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর তপন কোট প্যান্ট ও ওভারকেট চড়াইয়া খিড়কির গলি দিয়া বাহির হইল, বাড়ির সামনে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল, তারপর বাস-রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। সারা রাত বাহিরে থাকিবে, ভোরের দিকে কাজ শেষ করিয়া ফিরিবে।

অতঃপর উহাদের নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল। সকালে সাড়ে ন'টার সময় শান্তা স্কুলে পড়াইতে চলিয়া যায়, বিকালে ফিরিয়া আসে। তপন সন্ধ্যার পর বাহির হয়, রাত্রে কখন ফেরে জানি না। উহাদের জীবনযাত্রা অতি শান্ত; বাড়িতে অতিথি আসে না, হয়তো বন্ধুবান্ধব চেনা-পরিচিত কেহ কাছাকাছি নাই। তপন বাড়ি হইতে রাত্রে বাহির বাহির হইবার পর বাড়ির ইলেকট্রিক বাতি নিবিয়া যায়, কেবল সামনের ঘরে মৃদু মোমবাতি জ্বলে। তাহাও আটটা বাজিতে না বাজিতে নিবিয়া যায়। শান্তা বোধ হয়। সারা দিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়ে।

উহাদের বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, তাই যখন তখন চোখে দূরবীন লোগাইয়া বাড়িটা দেখি। কিন্তু বাহির হইতে বাড়ির অভ্যন্তর কিছুই দেখা যায় না; সদর দরজা। যেমন বন্ধ থাকে, সদরের জানালায় তেমনি পদার্স টানা থাকে। কেবল রাত্রিকালে পদার ভিতর দিয়া মোমবাতির মোলায়েম আলো দেখা যায়।

একদিন রবিবার সকালবেলা শান্তা আসিয়া খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পসল্প করিল। আমি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কতটি এখনো ঘুমোচ্ছেন বুঝি?'

সে সলজ্জভাবে বলিল, 'হ্যাঁ, সারা রাত ঘুমোতে পায় না, তাই—'

আমি বলিলাম, 'তুমি রাত্রে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাও না দেখেছি। কেন বল দেখি?'

শান্তা সচকিত হইয়া বলিল, 'আমার চোখ ভাল নয়, উজ্জ্বল আলো বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। ও আবার কম আলোয় দেখতে পায় না। তাই ও চলে গেলেই ইলেকট্রিক নিবিয়ে পিদিম জ্বলি। আপনি লক্ষ্য করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই জানালার ধারেই বসে থাকি।'

শান্তা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'সত্যি, আপনার তো কোথাও যাবার উপায় নেই। তা আমি মাঝে মাঝে আসব, ওকেও পাঠিয়ে দেব।'

এইভাবে চলিতেছে। একদিন সন্ধ্যার পর তপন ও কাজে যাইবার পথে আমার কাছে আসিয়া দুই চারিটা কথা বলিয়া গেল।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম।

আমি সাধারণত রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় শয়ন করি। কিন্তু আমার অনিদ্রা রোগ আছে, মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না, তখন প্রায় সারা রাত জাগিয়া থাকি। দুই হপ্তা আগে রাত্রে যথাসময় শয়ন করিলাম। কিন্তু কিছুঁতেই ঘুম আসিল না। বারোটা পর্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; ভাবিলাম এক পেয়ালা গরম কোকো পান করিলে ঘুম আসিতে পারে। স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিলাম। রামাধীন আমার ঘরের বাহির দ্বারের সম্মুখে শয়ন করে, তাহাকে আর জাগাইলাম না।

শীতের রাত্রি, জানালা বন্ধ আছে। হঠাৎ কি মনে হইল, জানালার খড়খড়ি তুলিয়া বাহিরে তাকাইলাম। নিষুতি রাত্রে রাস্তায় জনমানব নাই; জোড়া-বাড়ির সামনে রাস্তার আলোটা জ্বলিতেছে। বাড়ি দুটোর ভিতরে অন্ধকার।

একটা লোক ওদিকের ফুটপাথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথা হইতে হাঁটু পর্যন্ত কালো র‍্যাপারে ঢাকা; জোড়া-বাড়ির বরাবর আসিয়া সে থামিল, ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে ও আশেপাশে দেখিল, তারপর সুট্টু করিয়া দুই বাড়ির মাঝখানে গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তপনের ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল।

কোকো প্রস্তুত করিয়া পান করিতে করিতে চিন্তা করিলাম। কে লোকটা? তাহার ভাবভঙ্গীতে যেন সতর্ক সাবধানতা রহিয়াছে। ওই গলি গিয়া মাদ্রাজীদের খিড়কি দরজাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজীরা সংখ্যায় অনেকগুলি, সন্ধ্যার পর দোর তালাবন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে; এই লোকটা নিঃসন্দেহে তপনের ঘরে গিয়াছে। তপন রাত্রে বাড়ি থাকে না, শান্তা একলা থাকে; এই সময় লোকটা চুপিচুপি আসিয়াছে। কী ব্যাপার!

গভীর রাত্রি, স্বামী অনুপস্থিত, বাড়িতে একটি যুবতী ছাড়া অন্য কেহ নাই; এই সময় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া লোক আসে। অর্থাৎ-?

মনটা খারাপ হইয়া গেল। শাস্তাকে ভাল মেয়ে বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আজকাল মুখ দেখিয়া স্ত্রী-চরিত্র বোঝা দুষ্কর। —মরুক গে, আমার কি! ভাড়াটেদের স্ত্রী কী করিতেছে তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি? আমার যথাসময়ে ভাড়া পাইলেই হইল।

একবার ভাবিলাম জানালায় দাঁড়াইয়া দেখি লোকটা কতক্ষণে বাহির হয়। কিন্তু কোকো পান করিয়া একটু ঘুমের আমেজ আসিতেছিল, আমি শুইয়া পড়িলাম। আসন্ন ঘুমকে খোঁচা দিয়া তাড়াইলে হয়তো সারা রাত জাগিয়া থাকিতে হইবে।

এই ঘটনার পর দুই হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে। গত রবিবার তপন আসিয়া বাড়িভাড়া দিয়া গিয়াছে, উল্লেখযোগ্য। আর কিছু ঘটে নাই। তপনকে নৈশ আগন্তুকের কথা বলি নাই। কী দরকার আমার?

তারপর হঠাৎ পরশু রাত্রির ব্যাপার!

পরশু রাত্রেও আমাকে অনিদ্রা রাগে ধরিয়াছিল। বারোটা পর্যন্ত বিছানায়। এ-পাশ ও-পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম; স্টোভে কোকোর জল চড়াইয়া দিয়া জানলার খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিলাম। লোকটা যেন আমার উঁকি মারার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল-সেই র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা। সে ফুটপাথ দিয়া দ্রুতপদে আসিয়া গলির ঠিক মুখের কাছে একটু ভিতর দিকে লুকাইয়া পড়িল। তারপর একই দিক হইতে আর একটা লোক আসিতেছে দেখিলাম; গলায় কর্ম্মফটার-জড়ানো লোকটা গলির মুখ পর্যন্ত আসিয়া

দাঁড়াইয়া পড়িল, অনিশ্চিতভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। মনে হইল সে র‍্যাপার-ঢাকা লোকটাকে অনুসরণ করিয়াছিল, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

এই সময় র‍্যাপার-ঢাকা লোকটা মুখ হইতে র‍্যাপার সরাইল। সবিস্ময়ে চিনিলাম–তপন। তারপর মুহুর্তে মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তপনের হাতে একটি ছুরি ঝালকাইয়া উঠিল, সে এক লাফে সামনে আসিয়া কর্ম্মফটার-জড়ানো লোকটার বুকে ছুরি বিঁধিয়া দিল। লোকটা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল। তপন বিদ্যুৎবেগে আবার গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমি হতভম্বভাবে চাহিয়া রহিলাম। লোকটা ফুটপাথের উপর নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে, একটা কাকুতি পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে–

আমার ঘরে টেলিফোন আছে। এই ঘটনার ধাক্কা সামালাইয়া আমি থানায় ফোন করিলাম। আমাদের থানা কাছেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িল। দারোগাবাবু আমার বয়ান শুনিয়া তপনের বাসা ঘেরাও করিলেন।

তপনকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। শান্তা ঘুমাইতেছিল, সে কিছু জানিতে পারে নাই। তপন খিড়কির দরজা খুলিয়া বাড়িতে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; সে বাসায় বস্ত্রাদি বদল করিয়া শান্তাকে না জাগাইয়া চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছে।

সে-রত্রে মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই; পরে জানা গিয়াছে মৃত ব্যক্তির নাম বিধুভুষণ আইচ, বর্ধমানের পুলিসের কর্মচারী ছিল, সম্প্রতি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল।।

তপনের বাসায় পুলিসের পাহারা কায়েম আছে। তপন এখনও ধরা পড়ে নাই। দারোগাবাবু ক্রমাগত শাস্তাকে জেরা করিয়া চলিয়াছেন। অথচ সে বেচারী নির্দোষ। আমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম সেজন্য লজ্জিত আছি। এখন বুঝিয়াছি তপনই মধ্যরাত্রে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত।

এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তপন কেন খুন করিয়াছে আমি কিছুই জানি না, অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন পুলিস অফিসার আসিয়া আমাকে জেরা করিয়া যাইতেছেন। আমি চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু মানুষ কিন্তু পুলিস বোধ হয় সন্দেহ করে যে খুনের জন্য আমি দায়ী। আমার অপরাধ এই যে, তপন আমার ভাড়াটে এবং আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখন আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন; আমার প্রাণ অতিষ্ঠা হইয়া উঠিয়াছে। পুলিস হয়তো সন্দেহের উপর আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরবে; তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব। আমার টাকা আছে; আপনি যদি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন। আমি আপনাকে খুশি করিয়া দিব।

আর অধিক কি।। যত শীঘ্র পাবেন আমাকে পুলিসের ঝামেলা হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বশংবদ

শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু

০২. শান্তা উরফে তপন সেন উরফে প্রমীলা

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ। করিল। আমি আর এক পেয়ালা চা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সত্যবতী হয়তো রাগিয়া আছে, তাহাকে ঠাণ্ডা করাও দরকার।

আধা ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ব্যোমকেশ চিঠি কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং আপনি মনে হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাসি কিসের?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্যাপারটাই হাসির। চিন্তামণি কুণ্ডু মশায় কিন্তু একটি বিষয়ে ভুল করেছেন, তপনের বাড়িতে বিদ্যুৎবাতি নিবে যাওয়ার সময়টা তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেননি।'

'তুমি কি করে তা জানলে?'

'আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আর একটা ভুল করেছেন, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক।' ব্যোমকেশ আবার মৃদু বঙ্কিম হাসিতে লাগিল। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, 'অজিত, চিন্তামণিবাবুর ঘরে টেলিফোন আছে, তুমি তাঁর নম্বর খুঁজে তাঁকে ফোন কর। একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর দরকার। তাঁকে জিজ্ঞেস কর তপনের গলার আওয়াজ কি রকম।'

'নিশ্চয় খুব জরুরী প্রশ্ন। আর কিছু জানতে চাও?'

'আর কিছু না। তাঁকে বোলো, ভাবনার কিছু নেই, আমি অবিলম্বে যাচ্ছি।'

চিন্তামনিবাবুকে ফোন করিলাম, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, 'তপনের গলার আওয়াজ চেরা-চেরা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চেরা-চেরা! তাহলে ঠিক ধরেছি, আর কোন সন্দেহ নেই।'

বলিলাম, 'কি ধরেছ তুমিই জান। কিন্তু চিন্তামণিবাবুর গলাও চেরা-চেরা মনে হল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাতে আর আশ্চর্য কি। একে পক্ষাঘাত, তার ওপর পুলিসের আতঙ্ক– চল, বেরিয়ে পড়া যাক। কাজ সেরে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করা যাবে।'

চিন্তামণিবাবুর বাড়ির রাস্তাটা বেশ চওড়া নূতন রাস্তা; শহরের অন্তিম প্রান্তে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন। তপন সেনের বাসা পুলিসের পাহারা দেখিয়া সহজেই সনাক্ত করা গেল। তাহার উল্টাদিকে চিন্তামণিবাবুর দ্বিতল বাড়ি। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

আমরা দ্বারের কড়া নাড়িবার পূর্বেই হিন্দুস্থানী ভৃত্য রামাধীন দ্বার খুলিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রবেশ করিলাম। খোলা জানালার পাশে চিন্তামণিবাবু চেয়ারে বসিয়া

ছিলেন, সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু। রাস্তায় আসতে দেখেই চিনেছি। , আসুন।'

রামাধীন দু'টি চেয়ার আগাইয়া দিল, আমরা বসিলাম। টেলিফোনে গলার আওয়াজ শুনিয়া চিন্তামণিবাবুর চেহারা যেমন আন্দাজ করিয়াছিলাম আসলে তেমন নয়; কৃষ্ণবর্ণ মোটাসোটা মানুষ, উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাশে টিপাই-এর উপর একটি দামী বাইনোকুলার রাখা রহিয়াছে।

চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আগে কি খাকেন বলুন।—চা—কোকো–ওভালটিন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন কিছু দরকার নেই। —পুলিস আজ আপনার কাছে এসেছিল নাকি?' চিন্তামণিবাবু বলিলেন, 'আসেনি আবার! দারোগা একবার আমার দিকে তেড়ে আসছে, একবার ও বাড়িতে শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। কী যে চায় ওরা বুঝি না। একই প্রশ্ন পঞ্চাশবার। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে পারি কিনা, বাইনোকুলার রেখেছি কেন, তপন সেনকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছি কেন? বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু, এ সব প্রশ্নের কী জবাব দেব? জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এখন আপনি আমাকে বাঁচান।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দারোগাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনি কি–'

বলিতে বলিতে দারোগাবাবু দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশ বারো বছর আগে বিজয় ভাদুড়ী যখন ছোট দারোগা ছিলেন তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। রোগী লম্বা বেউড় বাঁশের মত চেহারা, কিন্তু অত্যন্ত কর্মতৎপর ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি। দশ বছরে তিনি বড় দারোগ হইয়াছেন। কিন্তু চেহারার তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং মনও যে পূর্ববৎ সন্দেহপরায়ণ আছে তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে অনুমান করা যায়।

দ্বারের নিকট হইতে প্রখর চক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, শুষ্ক স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে!'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা–আপনার আসামী, মানে, তপন সেন ধরা পড়ল?'

বিজয় ভাদুড়ী একবার চিন্তামণিবাবুকে বক্রদৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'ধরে পড়েনি এখনো, কিন্তু যাবে কোথায়? আপনি হঠাৎ এখানে কী উদ্দেশ্যে, ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চিন্তামণিবাবু আমার মক্কেল। ওঁর বাড়িতে খুন হয়েছে, ওঁর ভাড়াটে খুন করেছে, আপনারা ওঁকে বিরক্ত করছেন। তাই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে উনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।'

বিজয় ভাদুড়ী কুটিল-কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, বোধ করি মনে মনে বিবেচনা করিলেন ব্যোমকেশকে গলা-ধাক্কা দিবেন কি না। তারপর তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, ‘একবার বাইরে আসবেন? দুটো কথা আছে।’

‘চলুন।’

আমরা ঘরের বাহিরে লম্বা বারান্দার এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। বিজয়বাবু মুখে একটা জোর করা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, ‘দেখুন ব্যোমকেশবাবু, উঁচু মহলে আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনি যদি এ মামলায় মাথা গলাতে চান আমি আপনাকে আটকাতে পারব না। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি চিন্তামণি কুণ্ডুকে সাহায্য করবেন না। আমার বিশ্বাস, ও আর ঐ খোট্টা চাকরিটা তলে তলে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে।’

ব্যোমকেশ স্থির হইয়া বিজয়বাবুর কথা শুনিল, তারপর বলিল, ‘কে খুন করেছে আপনি জানেন?’

বিজয়বাবু বলিলেন, ‘অবশ্য খুন করেছে তপন সেন, কিন্তু বুড়োটাও এর মধ্যে আছে।’

‘বুড়োটাও যদি এর মধ্যে থাকতো তাহলে তপনের নামে খুনের অভিযোগ আনতো কি?’

‘ঐখানেই চালাকি। তপনকে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ো নিজেকে বাঁচাতে চায়।’

ব্যোমকেশ বিরক্ত স্বরে বলিল, 'মাপ করবেন বিজয়বাবু, আপনি এ মামলার কিছুই বুঝতে পারেননি।'

ভ্রূকুটি করিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, 'তার মানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মানে পরে বলব। আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি।–যে ছুরি দিয়ে খুন হয়েছিল সেটা পাওয়া গেছে কি?'

'না। তপন সেটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'তপনের বাড়ি তল্লাশ করে কিছু পেয়েছেন?'

'না, এমন কিছু পাইনি যাতে হদিস পাওয়া যায়। তবে সিন্দুকটা এখনো খোলা হয়নি, তার চাবি তপনের কাছে।'

'শান্তাকে জেরা করে কিছু পেয়েছেন?'

'কাজের কথা কিছু পাইনি। মাস চারেক আগে ওদের বিয়ে হয়েছে; স্বামীর কাজকর্মের কথা শান্তা কিছুই জানে না।'

'আমি কিন্তু সব জানি। কে খুন করেছে জানি, এমন কি আসামী কোথায় আছে তাও জানি—'

বিজয়বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, 'জানেন তবে এতক্ষণ বলেননি কেন?'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'সময় হলেই বলব। তার আগে আমি তপনের বাসাটা একবার ঘুরে ফিরে দেখতে চাই। আর শাস্তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্য তাকে যথেষ্ট জেরা করেছেন এবং সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছেন। আমি কেবল দুচারটে প্রশ্ন করব।'

বিজয়বাবু বলিলেন, 'তা বেশ। কিন্তু আসামী–'

'আসামীকেও পাবেন।'

'কোথায়? ওই বাড়িতে? আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। আগে চলুন ওই বাড়িতে। আসামীকে ধরার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন।'

'তার মানে-আপনি বলতে চান তপন সেন বাসায় ফিরে আসবে, কিম্বা বাসাতেই লুকিয়ে আছে–?'

'আসুন আসুন—' ব্যোমকেশ অগ্রগামী হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিল, চিন্তামণিবাবুর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, 'চিন্তামণিবাবু, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমরা একবার ও বাড়িতে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খুনের কিনারা হয়ে যাবে।'

তারপর আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামিয়া গেলাম।

তপনের বাসার বুকে-পিঠে পুলিস পাহারা। একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, চোর পালাইলে পুলিসের বুদ্ধি বাড়ে। অপরাধী যখন অপরাধ করিয়া চম্পট দিয়াছে তখন অকুস্থলের চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইয়া কী লাভ হয় আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যোমকেশ গলি দিয়ে খিড়কির দরজার দিকে যাইতে বলিল, 'সদর আর খিড়কির দরজা ছাড়া বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো রাস্তা নেই? পাঁচিল ডিঙিয়ে পালানো যায় না?'

দারোগ বিজয়বাবু বলিলেন, 'না।'

খিড়কির দরজায় একজন পাহারাওলা দাঁড়াইয়া আছে, উপরন্তু দরজায় তালা লাগানো। বিজয়বাবুর হুকুমে পাহারাওলা তালা খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে গেলাম।

ছোট্ট এক টুকরা উঠানের গায়ে দু'টি ঘর, পাশে রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। ব্যোমকেশ বলিল, 'বিজয়বাবু, আপনি আর অজিত শান্তার কাছে গিয়ে বসুন, আমি স্নানের ঘর আর রান্নাঘর এক নজর দেখে যাই।' বলিয়া সে পাশের দিকে চলিল।

আমরা সামনের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বসিবার ঘর। বেতের আসবাব দিয়া সাজানো। একটি বেতের চেয়ারে শান্তা উদাস অসহায়ভাবে বসিয়া আছে। চিন্তামণি কুণ্ডু তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা সত্য; বর্তমানে তাহার মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত; চোখ দু'টিও ফুলোফুলো। বোধহয় কান্নাকাটি করিয়াছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিল। আমাকে লক্ষ্যই করিল না, বিজয়বাবুর দিকে সপ্রশ্ন চক্ষে চাহিল। বিজয়বাবু কিছু বলিলেন না, একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। আমিও বসিলাম।

তিনজনে নির্বাক বসিয়া আছি। আমি চিন্তা করিতেছি-পুলিসের জেরা শুনিয়া শুনিয়া মেয়েটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে যদি নির্দোষ হয়, স্বামীর অপরাধের সহিত তাহার যদি কোনও সংযোগ না থাকে, তবু তাহার নিস্কৃতি নাই। কিন্তু তপন ওই লোকটাকে খুন করিল কেন? যৌন ঈর্ষা? শান্তার সঙ্গে ঐ লোকটার কি-?

ব্যোমকেশ শয়নকক্ষ হইতে প্রবেশ করিল; তাহার মুখ হাসি হাসি। সে শান্তার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শান্তাও ক্লান্তভাবে তাহার পানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার চোখে শঙ্কা ও সতর্কতা ফুটিয়া উঠিল। সে সোজা হইয়া বসিয়া একটু বিহ্বলভাবে বলিল, 'কী—কী—?'

ব্যোমকেশ প্রফুল্ল স্বরে বলিল, ‘আপনার শোবার ঘরে একটা ছোট লোহার সিন্দুক রয়েছে দেখলাম। ওতে কী আছে?’

শাস্তা বলিল, ‘দারোগাবাবুকে তো বলেছি, কি আছে আমি জানি না। আমার স্বামী সিন্দুকের চাবি নিজের কাছে রাখতেন।’

বিজয়বাবু বলিলেন, ‘সিন্দুকের তালা ভাঙবার ব্যবস্থা করেছি।’

‘বেশ বেশ, ওতে অনেক মাল পাবেন; চোরাই মাল, দুপুরে ডাকাতির গয়নাপত্র।’– ব্যোমকেশ শান্তার দিকে ফিরিল, ‘আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনার স্বামী কি দাড়ি কামাতেন না? বাড়িতে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নেই।’

শান্তার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, ‘তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘ও। আপনার স্বামী দেখছি অসামান্য লোক ছিলেন। তিনি সেলুনে দাড়ি কামাতেন, কিন্তু বাড়িতে চটি জুতো পরতেন না। কোনো কারণ ছিল কি?’

শান্তা চক্ষু নত করিয়া বলিল, ‘ওঁর চটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, নতুন চটি কেনা হয়নি। যখন বাড়িতে থাকতেন। আমার চটি পরতেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই নাকি। আপনাদের দু'জনের পায়ের মাপ তাহলে সমান?'

শান্তা বলিল, 'প্রায় সমান।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর দেখছি প্রায় সবই সমান, কেবল চুলের রঙ আলাদা। চিন্তামণিবাবু জানিয়েছিলেন তপনের চুলের রঙ তামাটে। ঠিক তো?'

শান্তা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।' বিজয়বাবু এতক্ষণ চোখ বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র উত্তেজনার কণ্ঠে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু–!'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'দাঁড়ান। তৈরি থাকুন, এবার আমার শেষ প্রশ্ন।–শান্তা দেবি, চিন্তামণিবাবু দেখেছিলেন। আপনার গালে মসুরের মত লাল তিল আছে, সে তিলটা গেল কোথায়?'

শান্তা চকিতে নিজের বা গালে হাত দিল, তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'তিল! আমার গালে তো তিল নেই, চিন্তামণিবাবু ভুল দেখেছেন। হয়তো লাল কালির ছিটে লেগেছিল–'

ব্যোমকেশের মুখে হিংস্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'সব প্রশ্নেরই জবাব তৈরি করে রেখেছেন দেখছি। কিন্তু এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন।' ক্ষিপ্রহস্তে সে শান্তার চুল ধরিয়া

টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খসিয়া আসিল, ভিতর হইতে থাকেইটা তামাটে রঙের চুল বাহির হইয়া আসিল।

শান্তাও বিদ্যুৎবেগে জবাব দিল। একটু অবনত হইয়া সে নিজের ডান পা হইতে শাড়ির প্রান্ত তুলিল। পায়ের সঙ্গে রবারের গীটার দিয়া আটকানো ছিল একটা লিকলিকে ছুরি। ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি মুষ্টিতে লইয়া শান্তা ব্যোমকেশের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইল। আমি ভয়ার্তা সম্মোহিতভাবে শুধু চাহিয়া রহিলাম; একটি স্ত্রীলোকের সুশ্রী কোমল মুখ যে চক্ষের নিমেষে। এমন কুশ্রী ও কঠিন হইয়া উঠিতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না।

দারোগা বিজয়বাবু যদি প্রস্তুত না থাকিতেন তাহা হইলে ব্যোমকেশের প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। তিনি বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া শান্তার কজি ধরিয়া ফেলিলেন; ছুরি শান্তার মুষ্টি হইতে স্বলিত হইয়া মাটিতে পড়িল। সে বিষাক্ত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া সর্প-তর্জনের মত নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ‘বিজয়বাবু, এই নিন। আপনার খুনী আসামী, আর এই নিন খুনের অস্ত্র!’

বিজয়বাবু একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন, ‘কিন্তু চিন্তামণিবাবু বলেছিলেন তপন সেন–’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তপন সেনের অস্তিত্ব নেই, বিজয়বাবু। আছেন কেবল অদ্বিতীয় শান্তা সেন; ইনিই রাত্রে তপন সেন, দিনে শান্তা সেন-সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। মহীয়সী

মহিলা ইনি। ভাববেন না যে, বিধুভূষণ আইচকে খুন করাই এর একমাত্র কীর্তি। মাস দুই আগে ইনি বর্ধমান জেলের এক গার্ডকে খুন করে জেল থেকে পালিয়েছিলেন। এঁর আসল নাম আমার জানা নেই; আপনি পুলিসের লোক, ফেরারী কয়েদীর নাম জানতে পারেন।’

বিজয়বাবু শান্তার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সুবর্তুল চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, ‘প্রমীলা পাল। এবার সব বুঝেছি। স্বামীকে বিষ খাওয়ানোর জন্যে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দু’বছর জেল খাটবার পর তুমি জেলের গার্ডকে খুন করে পালিয়েছিলে। পালিয়ে এখানে এসে একাই স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়েছিলে। তারপর সে-রাত্রে বিধুভূষণ তোমাকে দেখতে পায়। বিধুভূষণ তোমাকে চিনতে পেরে তোমার পিছু নিয়েছিল। এইখানে বাড়ির সামনে এসে তুমি তাকে খুন করেছ।’ ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বিজয়বাবু বলিলেন, ‘কেমন—এই তো?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘মোট কথা এই বটে।’

বিজয়বাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন, ‘জমাদার।’

জমাদার ঘরের বাহিরেই ছিল, প্রবেশ করিল। বিজয়বাবু বলিলেন, ‘হাতকড়া লাগাঁও।’

চিন্তামণিবাবুর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার চিঠি পড়ে খটকা লেগেছিল, চিন্তামণিবাবু। আপনি ওদের দু’জনকে একসঙ্গে কখনো দেখেননি , দূরবীন লাগিয়েও ওদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। কেন? পুরুষটা বেঁটে, মেয়েটা লম্বা; হরে দরে হাঁটু জল। ওরা সদর দরজা দিয়ে যাতায়াত করে না, খিড়কি দিয়ে আসে যায়; পুরুষটা চেরা-চেরা গলায় কথা বলে। কেন? সন্দেহ হয় যে কোথাও লুকোচুরি চলছে।

‘কিন্তু বেশি ফলাও করে সব কথা বলবার দরকার নেই। স্থূলভাবে ব্যাপারটা এই—জেল ভেঙে পালাবার পর প্রমীলা পালের দুটো জিনিস দরকার হয়েছিল; ছদ্মবেশ আর রোজগার। তার মাথার চুল তামাটে রঙের, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাই তাকে চুল ছেঁটে পুরুষ সাজতে হল। কিন্তু দুপুরে ডাকাতি করে রোজগার করার জন্য তার মেয়েমানুষ সাজা দরকার, তাই সে একটি সুন্দর বিলিতি পরচুলো যোগাড় করল। কোথায় চুল ছেটেছিল, কোথা থেকে পরচুলো যোগাড় করল আমি জানি না; কিন্তু তার দ্বৈত-জীবন আরম্ভ হল। এখন শীতকাল চলছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সাজার খুব সুবিধা। সে নাকের নীচে একটি ছোট্ট প্রজাপতি-গোঁফ লাগালো, গায়ে কোট-প্যান্টের ওপর ওভারকেট চড়ালো, তারপর আপনার কাছে বাড়ি ভুগড়া নিতে এল; পাছে মেয়েলি গলা ধরা পড়ে। তাই আপনার সঙ্গে চেরা-চেরা গলায় কথা কইল। কলকাতা শহরে ছদ্মবেশে থাকার খুব সুবিধা, পাড়াপাড়শী কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু সে লক্ষ্য করল। আপনি সারাক্ষণ জানালার কাছে বসে থাকেন, আপনার বাইনোকুলার আছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে।

'সে-রত্রে আপনি শুয়ে পড়বার পর সে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি দখল করতে এল। কেউ জানতে পারল না যে মাত্র একজন লোক এসেছে, দু'জন নয়। তার সঙ্গে একটা ছোট্ট লোহার সিন্দুক ছিল, সেটা সে শোবার ঘরে রাখল।

'তারপর তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। সকালবেলা সে স্কুলে পড়বার নাম করে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা 'দুপুর ডাকাতি করার মতলবে ঘুরে বেড়ায়, বিকেলবেলা ফিরে আসে। আবার সন্ধ্যের পর পুরুষ সেজে বেরোয় আপনাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে। ঘরের বিদ্যুৎবাতি নিবিয়ে পিদিম জ্বেলে রেখে বেরোয়; তেল ফুরোলে পিদিম নিবে যায়, আপনি ভাকেন শান্তা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। আপনি কেবল একটা ভুল করেছিলেন; ইলেকট্রিক বাতি যে তপন বাড়ি থেকে বেরুবার আগে নেবে সেটা লক্ষ্য করেননি। আপনার মনে সন্দেহ ছিল না। তাই লক্ষ্য করেননি।

'যাক, আপনি শুয়ে পড়বার পর সে আবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং ঘুমোয়। একটা আলোয়ান সে সম্ভবত ওভারকেটের নীচে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বেরুতো, ফেরবার সময় সেটা গায়ে জড়িয়ে নিত। তাই প্রথম যে-রাত্রে আপনি খড়খড়ি তুলে তাকে ফিরতে দেখলেন, আপনি ভাবলেন সে শান্তার গুপ্ত প্রণয়ী।

'এইভাবে চলছিল। তারপর প্রমীলার হঠাৎ ভীষণ বিপদ উপস্থিত হল। বিধুভুষণ আইচ পুলিসের কর্মচারী, প্রমীলাকে আগে দেখেছিল, ছুটিতে কলকাতায় এসে সে প্রমীলাকে দেখতে পেল এবং পুরুষের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পারল। সে প্রমীলার পিছু নিল।

হয়তো কোনো হোটেলে দু'জনের দেখা হয়েছিল। প্রমীলা নিশ্চয় তাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন পারল না, তখন–'

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া ব্যোমকেশ থামিল, সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। বিধুভুষণকে খুন করে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে পালাল না কেন? ব্যোমকেশ বলিল, 'পালাবার সময় পেল না। সে তো জানত না যে চিন্তামণিবাবু খড়খড়ি তুলে হত্যাকাণ্ডটা দেখে নিয়েছেন। তাই তার বিশেষ তাড়া ছিল না; ভেবেছিল দামী জিনিসপত্র গয়নাগটি নিয়ে ধীরে সুস্থে পালাবে। কারণ ও বাড়িতে থাকা আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়; বাড়ির সামনে লাশ পড়ে আছে, পুলিস নিশ্চয় তাকে জেরা করতে আসবে। প্রমীলা পাল জেল-ভাঙা খুনী আসামী, যদি পুলিসের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পারে? সুতরাং নিশ্চয় সে পালাতো। কিন্তু হঠাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তখন আর পালাবার রাস্তা নেই, প্রমাঈলা তাড়াতাড়ি পরচুলোটা পরে নিয়ে মেয়ে সাজল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে গালের তিলটা আঁকতে ভুলে গেল।'

'গালে তিল আঁকতো কেন?'

'দুটো চেহারায় রকমফের আনবার জন্যে। পুরুষবেশে নাকের নীচে গোঁফ লাগাতো, আর স্ত্রীবেশে পারচুলো ছাড়াও গালে তিল আঁকত। বুঝেছি?—আজ তাহলে উঠি, চিন্তামণিবাবু।'

চিন্তামণিবাবু গদগদ ধন্যবাদ সহ একটি দুইশত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। আমরা ফিরিয়া চলিলাম।

বেলা দুটা বাজিতে বিলম্ব নাই। পুলিস আসামীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত বিজয় ভাদুড়ী মহাশয় খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া নিশ্চয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করিবেন।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখি সত্যবতী দরজার কাছে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের দেখিয়া ভ্রূ তুলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। অর্থাৎ-এত দেরি যে!

ব্যোমকেশ হঠাৎ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাত বাড়াইয়া সত্যবতীর চিবুক একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, ‘তোমরাও কম যাও না।’